Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 173–181
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

'ঘরে বাইরে' : রবীন্দ্রভাবনায় বৌদ্ধধর্ম-দর্শন

বাপ্পী বর্মণ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : barmanbappi09@gmail.com

Keyword
বুদ্ধ মতাদর্শ, সিংহল, গীতাঞ্জলি, মানবীয় মহিমা, মুক্তধারা, রক্তকরবী

Abstract

Discussion

> "জরা-মৃত্যু-বিভীষিকা, জীব-জন্ম তাহার নিদান –
> সেই ব্যাধি, মহাদুঃখ দূর করি' মানবে নির্ভয়
> করেছিলে হেতাপস, পৃথিবীর প্রথম সন্ন্যাসী!
> বিষেরঔষধ বিশপিয়াইলে, ভিষক-প্রধান!
> ধরার পীড়িতজনে,-কামনার অঙ্কুশ দুর্জয়
> ভাঙিলে কৌশলেবীর, কামনারঅঙ্কুশ বিনাশি।"[১]

মানুষের নিত্যদিনের জীবনে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু, শোক-যন্ত্রণা নিরীক্ষণ করে, দুঃখ কবলিত মানুষের দুঃখ নিরোধের উপায় নির্দেশ করে, যিনি নিজের মতাদর্শকে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, তিনি হলেন বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেব। একমাত্র মৌর্যসম্রাট অশোককে বাদ দিলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে পাল যুগের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। এই বৌদ্ধধর্মের উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- আস্তিক ও নাস্তিক। নানা মত ও পথ অবলম্বনে বহুমুখী উপলব্ধি নিয়ে গঠিত বিভিন্ন নাস্তিক দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধদর্শন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ। এই বুদ্ধ মতাদর্শ ভারত তথা বাংলার ইতিহাসে শিল্প-সাহিত্য-রাষ্ট্রসাধনায় ও প্রাণচেতনায় যে আদর্শ স্থাপন করেছে, তা বাঙালি জাতির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। বৌদ্ধধর্মের গরিমা প্রকাশ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধে বলেছিলেন-

> "বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল- বর্ণবৈষম্য কতকদূর বিলুপ্ত হইল। প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত রহিল। পুরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, সেই সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৈষ্ঠবের সময়।"[২]

আমাদের জাতীয় চিত্তে ভগবান বুদ্ধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অবদান অপরিসীম। তবে রবীন্দ্রচেতনায় বৌদ্ধ ভাবনার কারণ হিসেবে একটি দিকের কথা বলা চলে, সেটি হলো তাঁর জন্মের পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বৌদ্ধভাবাদর্শের পরিচিতি। দেবেন্দ্রনাথ সিংহল থেকে বৌদ্ধ ধর্মের যে জীবন্ত আদর্শ নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। সমাজসচেতন কবি চিত্তে যে, সে যুগের চিন্তাধারা সাড়া জাগাবে তা নিতান্ত স্বাভাবিক। তৎকালে আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার হয় তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের যোগ ছিল নিবিড়। তাছাড়া বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনুশীলনরত বহু বাঙালি মনীষীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মবিজিত এশিয়ার প্রায় সকল দেশ পারিভ্রমণ করেছেন। সেখানে তিনি দেখেছেন বৌদ্ধ ধর্মের জীবন্ত রূপ। আর একথাও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, সেখানকার শিল্পসভ্যতা ও জাতীয় জীবন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণরসেই পুষ্ট হয়েছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'জাপান-যাত্রী'(১৯১৯) গ্রন্থে। তিনি দেখিয়েছেন ভারতের মর্মস্থল থেকে উৎসারিত বৌদ্ধধর্মের প্রসাদের গুণেই জাপানিদের সংযম ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটেছে।

ইতিহাসের গতিপথে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের নিকট মহামানবরূপেই প্রতিভাত হয়েছেন এবং মানবীয় মহিমার প্রতিই তিনি অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। রবীন্দ্র ভাবনার এই প্রভাব পড়েছে তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) কাব্যের 'ভারততীর্থ' কবিতায় সেজন্য তিনি বলতে পেরেছেন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা –

> "হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
> হেথায় দ্রাবিড়,চীন –
> শক- হুন - দল পাঠান মোগল
> এক দেহে হল লীন।
> পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
> সেথা হতে হবে আনে উপহার,
> দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
> যাবে না ফিরে,
> এই ভারতের মহামানবের
> সাগরতীরে।"[৩]

রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধমহিমা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। আমাদের দেশে বৌদ্ধসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের এক সন্ধিপর্বে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বুদ্ধদেবের অন্তহীন করুণার আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে কত গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে তার পরিচয় রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিটি বিভাগেই সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে –

> "মানবমহিমার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ হয়েছে বুদ্ধদেবের মধ্যে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধার নিদর্শন তাঁর জীবন ও সাহিত্যে সমভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য ('কথা'-১৯০০), নাটক ('মালিনী'-১৮৯৬, 'বিসর্জন'-১৮৯০, 'রাজা'-১৯১০, 'অচলায়তন'-১৯১২, 'নটীর পূজা'-১৯২৬, 'চণ্ডালিকা'-১৯৩৩ প্রভৃতি) ও মননের সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধমহিমাকে যে বিশিষ্টতা দান করেছেন তার তুলনা নেই। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সবমিলিয়ে তিনি পঞ্চাশের অধিক নাটক রচনা করেছেন। এরমধ্যে বৌদ্ধযুগের কাহিনি নিয়েই তিনি সর্বাধিক নাটক রচনা করেছেন। রূপবৈচিত্র্য ও ভাবগভীরতায় তাঁর বৌদ্ধ আখ্যানমূলক নাটকগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তিনি প্রায় সমস্ত আখ্যায়িকাগুলি গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধদের সংস্কৃত অবদান থেকে। আর অবদানের

যেসকল কাহিনি তিনি কাব্য ও নাটকের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন সেগুলিকে নিজের মতো করেই নিয়েছেন। তদানীন্তন ভারতবর্ষে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের যে সূচনা হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই নাটকগুলিতে। আবার রাষ্ট্র ও সমাজের কলকোলাহলের ঊর্ধ্বে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সর্বত্রই বৌদ্ধধর্মের কালজয়ী মহিমার জয় ঘোষণা করেছেন। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম এখানে চিরন্তন মানবধর্মেরই প্রতিরূপ। আর বৌদ্ধধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের মূলেও রয়েছে এই সত্য। অচলায়তনে পঞ্চককে লেখক মুক্তিপিপাসু মানবাত্মার প্রতীক হিসেবে দেখিয়েছেন। এর সঙ্গে 'ডাকঘরের' অমল, 'মুক্তধারার' অভিজিৎ এবং 'রক্তকরবীর' রঞ্জনের মিল দেখা যায়। নাটকের পাশাপাশি তাঁর 'কথা'(১৯০০) কাব্যের অন্তর্গত বৌদ্ধ আখ্যানমূলক কবিতাগুলিতে বৌদ্ধযুগের ও বৌদ্ধ ভাবাদর্শের পরিচয় অতি সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। উল্লেখিত নাটক ও কাব্যগুলি ছাড়াও উপন্যাসের কোন কোন আদর্শ চরিত্র চিত্রণে কবি তাঁর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বুদ্ধদেবের চরিত্র দ্বারা যে একেবারে প্রভাবিত হননি, তা জোর করে বলা যায় না। বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বনে উপন্যাসের কাহিনি রচিত হয়নি কিন্তু রবীন্দ্রভাবনায় বুদ্ধচরিত্র ও বৌদ্ধদর্শনের নানাদিক কোন কোন উপন্যাসের মধ্যে যে প্রতিফলিত হয়েছে, তা বলা যেতে পারে। এরকমই একটি উপন্যাস হলো 'ঘরে বাইরে'(১৯১৬)। এই উপন্যাসের মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথবাবু সর্বোপরি নিখিলেশের আত্মকথার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধচরিত্র ও বৌদ্ধদর্শনের নানাদিক দেখানোর চেষ্টা করা যেতে পারে।

অখণ্ড জীবনসত্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভগবান বুদ্ধের মানবতার জয় গানে স্বতই উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। বৌদ্ধধর্মে মানবপ্রীতিই ঈশ্বরপ্রীতি। মন্দির, মসজিদ, গির্জা নয় মানুষের মধ্যেই তিনি ভগবানকে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি যে মানবতাবাদের পূজারী তা তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে –

> "দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ পাপপুণ্য মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির।"[৫]

উপন্যাসে নিখিলেশের মধ্যেও মানবতাবাদের এই প্রত্যয় আমরা লক্ষ করতে পারি, যা তাঁর আত্মকথায় স্পষ্ট –

> "আমি নরনারায়ণের উপাসক - মানুষের মধ্যেই ভগবানের সত্যকার প্রকাশ।"[৬]

নিখিল মানবের দুঃখ মোচনের সংকল্প নিয়ে বুদ্ধদেব রাজ-সংসার সব ত্যাগ করেছিলেন। এই ত্যাগের দ্বারা তিনি মানব হৃদয়ে যে স্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন তাতে কপিলবাস্তুর সিংহাসন তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছিল। বুদ্ধ মহিমার এই রূপ রবীন্দ্র ভাবনায় নিখিলেশের আত্মকথার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। অভুক্ত খেটেখাওয়া হতদরিদ্র পঞ্চুর মত সহস্র মানুষের করুণ পরিস্থিতি তাঁকে দেশ-সমাজ সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। উপন্যাসে বিমলার উদ্দেশ্যে নিখিলেশের আত্মকথায় আমরা শুনতে পারি আত্মত্যাগের সুর –

> "স্থির করেছিলুম এই ভাবনাতেই প্রাণ দেব। সেদিন বিমলকে এসে বললুম, বিমল আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূলছেদনের কাজে লাগাব। বিমল হেসে বললে, তুমি দেখছি আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, দেখো শেষে আমাকে ভাসিয়ে চলে যেয়ো না। আমি বললুম, সিদ্ধার্থের তপস্যায় তার স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।"[৭]

দেশের দুঃখমোচনের কাজে যেখানে আত্মত্যাগের সংকল্প জেগেছে, সেখানেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্যাগের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়েছেন বুদ্ধদেবের মধ্যে, যিনি প্রিয়তমা পত্নী ও রাজ-সংসার ছেড়ে মানুষের দুঃখমোচনের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই ত্যাগের চিত্র 'ঘরে বাইরে' ছাড়া অন্যত্রও রয়েছে। যে ভারতীয় মহিমা নৃপতিকে মুকুট দণ্ড ও সিংহাসন ত্যাগের অনুপ্রেরণা দান করেছে, রবীন্দ্রসাহিত্য সেই আদর্শের জয়গানে মুখর। সেজন্য

ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অশোক ও শিবাজী রবীন্দ্রনাথের এত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন' নাটকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট আদর্শ নৃপতি গোবিন্দমাণিক্য ও 'শারদোৎসব'-এর বিজয়াদিত্য এঁরা প্রত্যেকেই সর্বস্ব ত্যাগের মধ্য দিয়ে সকলকে জয় করেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আর এক মহৎ আত্মত্যাগের বীর্যবান দেদীপ্যমান চরিত্র 'চতুরঙ্গে'-র নাস্তিক জ্যাঠামশাই।

ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সমস্ত কিছু সুন্দর হয়ে ওঠে। ভক্তির মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বিশ্বহৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বুদ্ধদেবের এই আদর্শে খানিকটা অনুপ্রাণিত হয়ে মানবপ্রেমের পূজারী হয়ে উঠেছেন। ত্যাগ ও প্রেমের দ্বারা সত্যকারের পৃথিবী জয় করার পক্ষে তিনি সওয়াল করেছেন। 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন –

> "প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ে এই-যে প্রেম উদ্‌বেলিত হয়েছে এটা একটা অবান্তর বিষয় নয় -এইটেই মুক্তি, এইটেই দেশের আপনাকে পাওয়া।"[৮]

রবীন্দ্রভাবনার এই প্রতিফলন আমরা লক্ষ করতে পারি নিখিলেশের কথার মধ্যে দিয়েও –

> "সুন্দরকে আমরা দেখতেই পাই নে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দেই। বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজাণ্ডার করেননি।"[৯]

রবীন্দ্রনাথের মতে, বুদ্ধদেব ত্যাগের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, পৃথিবী জয় করেছিলেন তা-ই সত্যকারের জয়। আর আলেকজাণ্ডার লোভের বশবর্তী হয়ে অস্ত্রের দ্বারা যে ভূ-খণ্ড অধিকার করেছিলেন তা সত্যকারের জয় নয়। সেজন্য দেখা যায়, আলেকজাণ্ডারের অস্ত্রবলে অর্জিত ভূ-খণ্ড কালক্রমে স্থায়ী হয়নি; কিন্তু বিনা অস্ত্রে অর্জিত বুদ্ধদেবের প্রেমের সাম্রাজ্য মানবমনে চিরদিন দেদীপ্যমান হয়ে আজও বিরাজ করছে।

বৌদ্ধধর্ম মানুষের জন্ম, কৌলিন্যকে অস্বীকার করে মানুষে মানুষে সমতার আদর্শ স্থাপন করে। বুদ্ধদেব জাতিভেদ অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মানুষের মুক্তি ঘোষণা করেছেন। তাঁর এই সীমাহীন মহত্ত্ববোধ মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথকে খানিকটা হলেও প্রভাবিত করেছিল। আমাদের দেশে মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে মনুষ্যত্বের বীভৎস অপমান রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে লক্ষ করেছেন। বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের উৎকটরূপ যেমন তাঁকে বেশি করে ভাবিয়ে তুলেছিল, তেমনি তা থেকে মুক্তির উপায়ও তিনি প্রকাশ করেছেন যথার্থ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধের কথা না বললেই নয়। সেখানে তিনি বলেছেন –

> "ধর্মমত ও সমাজরীতির সম্বন্ধে হিন্দুমুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, একথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে তৎসত্ত্বেও ভালো রকম করে মেলা চাই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের না হলে নয়।"[১০]

অর্থাৎ জাত-পাতের ঊর্ধ্বে রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি মানুষের মর্যাদাকে বড় করে দেখেছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের মধ্যেও আমরা এরূপ জীবনবোধ লক্ষ করতে পারি, যা সন্দীপের মধ্যে নেই বললেই চলে। সন্দীপ যে কতটা মুসলমান বিদ্বেষী, তা তাঁর কথায় স্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে –

> "আমি যদি এখানকার জমিদার হতুম তাহলে ভাবনার কথা হত মুসলমানদের, আমার নয়।"[১১]

সন্দীপের এই সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণু মনোভাবেই পক্ষান্তরে নিখিলেশের চরিত্রটিকে আরো বেশি করে পরিস্ফুট করেছে। সন্দীপের প্রতি সেই অঞ্চলের মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ভিতরে ভিতরে গুঞ্জরিত এই চাপা কথাটা নিখিলেশের কানে এসেছিল। তাই সন্দীপের মঙ্গলার্থে নিখিল তাকে সতর্ক করার জন্য বলেছে –

> "কিছুদিন ধরে ঢাকা থেকে মৌলবি আনাগোনা করতে আরম্ভ করেছে, এ অঞ্চলের মুসলমানদের ভিতরে ভিতরে ক্ষেপিয়ে তোলাবার উদ্যোগ চলছে। তোমার ওপর ওরা বিরক্ত হয়ে আছে, একটা কিছুউৎপাত করতে পারে।"[১২]

কিন্তু সন্দীপ উল্টে নিখিলেশকেই বলেছে মুসলমানদের চাপে রাখার কথা। কেননা তাঁর ধারণা, ক্ষমতার জোরে নিখিলেশ ইচ্ছে করলেই সংখ্যালঘু মুসলমানদের চাপে রাখতে পারে। কিন্তু নিখিলেশ হিন্দু জমিদার হলেও কখনো মুসলমানদের আলাদা চোখে দেখতেন না। তাঁর মতে –

> "ভারতবর্ষে যদি সত্যকার জিনিস হয় তাহলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।"[১৩]

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি যেখানে দেখা দিয়েছে সেখানে জয়লাভ করেছে। অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হলেও স্বাধীনতার নেপথ্যে উভয় সম্প্রদায়ের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। আর এই চেতনাবোধ নিখিলেশের মধ্যে সদা জাগ্রত যা সন্দীপের মধ্যে নেই। লোভের দ্বারা সন্দীপের শ্রেয়োবোধ আচ্ছন্ন। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে যে স্বার্থের সংঘাত, সিদ্ধির স্পর্ধায় মানুষ যেভাবে ন্যায়বোধ, ধর্মবোধকে অনায়াসে পদদলিত করতে পারে, তার ভয়াবহ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। অপরপক্ষে তাঁর সৃষ্ট নিখিলেশ যেন যুগ আদর্শ পুরুষ। ক্ষমতার অপব্যবহার, উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ, জাতিবিদ্বেষ তাঁর মধ্যে ছিল না। নিখিলেশ কখনই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরুদ্ধতাকে মানতে চাননি; বরং যাতে ভেদাভেদ সৃষ্টি না হয় তারই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। মুসলমানদের নিয়ে সন্দীপ যে ভালুকনাঁচের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা নিখিলেশের সততার গুণে বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। তাই নিখিলেশকে বলতে শোনা যায় -

> "নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই।"[১৪]

বুদ্ধদেবের করুণার জয়গানের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবনে নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ব্যক্তি কর্মজীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর অফুরন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার নিদর্শন বিশ্বভারতী স্থাপন। আর বুদ্ধদেবের করুণার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম অনুরাগ সহজেই অনুমান করা যায় তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে। রবীন্দ্রসাহিত্য অহিংসা ও করুণার বাণীতে পরিপূর্ণ। এই অহিংসা ও করুণার আদর্শ আমরা লক্ষ করতে পারি নিখিলেশের আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে। তিনি হিংসা নয়, অহিংসার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই স্বদেশি আন্দোলনে তিনি সশস্ত্রে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি স্বদেশি আন্দোলনে বিলিতিপণ্য বয়কটের বিরোধিতা করেছিলেন। তাই তিনি উপন্যাসে নিখিলেশের মুখেই শুনিয়েছেন –

> "জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্বলতা বলেই জানি। যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না; ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা সে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়।"[১৫]

অপরদিকে নিঃসহায়-সম্বলহীন দীনদরিদ্র পঞ্চুর প্রতি চন্দ্রনাথবাবুও নিখিলেশের স্ব-হৃদয় ব্যাকুলতার ক্ষেত্রে বুদ্ধের করুণার জয়গানের আদর্শরূপটি অনুসৃত হয়েছে। জমিদার হরিশ কুণ্ডুর প্রজা পঞ্চুর আর্থিক অবস্থা দারিদ্র্যসীমার নিচে বললেই চলে। একটা চাঙারিতে করে পান দোক্তা, রঙিন সুতো, আয়না, চিরুনি প্রভৃতি চাষার মেয়েদের লোভনীয় জিনিস নিয়ে হাঁটুজল ভেঙ্গে দিনরাত একাকার করে নমঃশূদ্রের পাড়ায় তাঁকে যেতে হয়। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে

বাতাসাওয়ালার দোকানে বাতাসা কাটা, শাখা তৈরিও করতে হয় দুবেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করার জন্য। ছেলে-পেলে নিয়ে বছরে অন্তত চার মাস তাঁর এক বেলার বেশি খাবার জোটে না। কিন্তু এত দারিদ্র্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর সততার অভাব ছিল না। একবার সে অভাবের তাড়নায় নিখিলেশের বাগান থেকে নারকেল চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, যেটা নিখিলেশের অজানা ছিল। নিখিলেশ এই ঘটনা জানতে পেরেছিল সেদিন, যেদিন পঞ্চু এক ঝুড়ি নারকেল তাকে দিতে এসেছিল। পঞ্চুর এই সদ্ব্যবহার নিখিলেশের হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়েছিল। পঞ্চুর এই শোচনীয় অবস্থা তাঁকে ব্যাথিত করেছিল। পঞ্চু তো শুধু একটা উদাহরণ মাত্র। দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত এইরকম অসংখ্য পঞ্চুর কথা কল্পনা করে মানবতার পূজারী নিখিলেশের মনে ধ্বনিত হয়েছে আত্মত্যাগের সুর। বিমলাকে নিখিলেশ বলেছে –

> "...আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূলছেদনের কাজে লাগাবো।"[১৬]

করুণা ও আত্মত্যাগের পাশাপাশি তাঁর মোহমুক্তির দিকটিও লক্ষ করা যায়। অতীত ও ভবিষ্যতকে জড়িয়ে যে মোহ বর্তমানের পথ ভোলায়, সত্যকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখে, তা থেকে মুক্তির কথাই শোনা যায় নিখিলেশের কণ্ঠে। সন্দীপের কথার উত্তরে নিখিলেশ বলেছেন –

> "যে কাজকে সত্য বলে শ্রদ্ধা করি তাকে সাধন করবার জন্য মোহকেদলেটানা চলবে না।. . . মোহকে ভাঙবার জন্যই দেবতা।"[১৭]

সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে মুক্তির আনন্দের পথই ছিলো নিখিলেশের পথ। যদিও বৌদ্ধদর্শনে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক নির্বাণ লাভের যে পন্থা স্বীকৃত হয়েছে তা রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে পুরোপুরি এক নয়। রবীন্দ্রনাথ বারবার এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, প্রেমই হলো পূর্ণতা বা পরম সত্য। সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেমন প্রকৃত নির্বাণ নয়, তেমনি সমস্ত বাসনা নিঃশেষে ধ্বংস করে নির্বাণমুক্তিকেও তিনি বৌদ্ধদর্শনের চরম লক্ষ বলে মনে করেন না। তবে চরম লক্ষ মনে না করলেও কিছুটা তাঁর নিজস্ব ভাবনার উপলব্ধির সঙ্গে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তাই ভগবান বুদ্ধ তাঁর চার প্রকার আর্যসত্যের চতুর্থ আর্যসত্যে দুঃখনিরোধ মার্গের যে আটটি অঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন, তার কোন কোন অঙ্গের সঙ্গে নিখিলেশ চরিত্রের মিল লক্ষ করা যায়।

বৌদ্ধদর্শনে দুঃখনিরোধ মার্গের আটটি অঙ্গের প্রথম অঙ্গটি হলো সম্যক দৃষ্টি। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে মিথ্যা দৃষ্টি হলো দুঃখের মূল কারণ। মানুষের মিথ্যা দৃষ্টি পরিবর্তন করা দরকার। এই মিথ্যা দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটেছিল বিমলার মধ্যে। বিমলা যে মিথ্যা দৃষ্টির দ্বারা অমূল্যকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিলেন, এই কথা শেষ পর্যন্ত নিজে স্বীকার করেছেন –

> "আমি তাকে তীরের মতো কেবল ছুঁড়তেই পারি, কিন্তু লক্ষ্য ভুল হলে তাকে আর কোনোমতে ফেরাতে পারিনে। এই অপরাধের মূলে যে আমি আছি এই কথাটা এখনই স্বীকার করা আমার উচিত ছিল।"[১৮]

কিন্তু এক্ষেত্রে নিখিলেশের যথার্থ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর বাস্তবজ্ঞান ও দূরদৃষ্টির অভাব ছিল না। তাই তিনি স্বদেশি আন্দোলনে বিলিতিপণ্য বয়কটের বিরোধিতা করেছিলেন। কেননা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে এতে বিদেশি শক্তির তেমন কোনো ক্ষতি হবেনা বরং আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরাই অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কেননা শিল্প-বিপ্লবের ফলে বিশ্বের বাজারে দেশীয় শিল্পের উৎপাদন মূল্য কয়েকগুণ বেশি। তাই বিলেতি পণ্য বয়কটের পক্ষে তিনি ছিলেন না। তাই বলে দেশীয় শিল্পের প্রতি তাঁর ভালোবাসা যে ছিল না এ কথা বলা যায় না। কেননা নিখিলেশ নিজেও একসময় দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য কারখানা এবং নিজের বাড়িতে এজাতীয় নানা জিনিস ব্যবহার করতেন। কিন্তু জ্ঞাতসারে আবেগের বশে সাধারণ মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার কোনো প্রয়াস তাঁর মধ্যে ছিল না। অতি স্বচ্ছ হিসাবটাকে গুলিয়ে ফেলে সন্দীপের মত তিনি সাধ্যের সাধনা না করে অসাধ্যের

সাধনায় দেশের কাজ করে দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্য আজগুবি চিন্তা ভাবনা করেননি। সত্যকে স্বীকার করে প্রয়োজনে মোকাবিলা করার মত সৎ সাহস তাঁর মধ্যে ছিল –

> "সত্যের সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপ সহ্য করবার শক্তি আমার আছে এই অহংকার আমার মনে ছিল।"[১৯]

মহৎ কাজ বা উদ্দেশ্য সাধনে সম্যকদৃষ্টির পাশাপাশি সম্যকসংকল্প বা দৃঢ় প্রত্যয় জরুরী, যা মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথ বাবু ও নিখিলেশের মধ্যে আমরা লক্ষ করতে পারি। তাই স্বদেশির প্রভাবে তাঁরা স্রোতে ভেসে যাননি; সাধারণ মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়েই এগিয়ে চলেছিলেন জীবনের পথে। হরিশ কুণ্ডুর গোমস্তা গুরুচরণ ভাদুড়ী, সানকিভাঙ্গার চক্রবর্তীর নায়েব প্রমুখ বিত্তশালী, অত্যাচারী, ভোগবাদী, স্বার্থপরায়ণ স্বেচ্ছাচারীদের হাত থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির বাসনাই ছিল নিখিলেশের সংকল্প। তাঁর মতে –

> "এই-সব গোমস্তা এই-সব কুণ্ডু এই-সব চক্রবর্তীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার কাজই আমার।"[২০]

এছাড়াও সন্দীপের নানা প্ররোচনামূলক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাবাপন্ন মন্তব্যেরও তিনি সুচিন্তিত জবাব দিয়েছেন। কোথাও কোন রকম উচ্চ-বাচ্য না করে নিজের বিশ্বাস, লক্ষ্য, সংকল্পে অটল থেকে নিরুত্তাপে সন্দীপকে সেই অঞ্চল ছেড়ে কলিকাতায় যাওয়ার কথা বলেছেন।

জীবনে মানবতার সাধনার আর একটি অন্যতম দিক হলো বাক-সংযম এবং ন্যায়সঙ্গত আচরণ, যা নিখিলেশ ও চন্দ্রনাথবাবুর মধ্যে লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে কোথাও তাঁদের অহেতুক বাক্যালাপ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, প্রলোভন, প্ররোচনামূলক উক্তি আমাদের চোখে পড়ে না। কর্মই ফল একথা চন্দ্রনাথবাবু একাগ্রচিত্তে বিশ্বাস করতেন। সন্দীপকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন –

> "পৃথিবীতে যে জাত আপনার জাতকে বাঁচিয়েছে তারা ছটফট করেনি, তারা কাজ করেছে। কাজটাকে যারা বরাবর বাঘের মতো দেখে এসেছে তারাই আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে করে অকাজের অপথ দিয়েই তারা তাড়াতাড়ি সংসারে তরে যাবে।"[২১]

চন্দ্রনাথবাবুর এই ন্যায়পরায়ন আচরণ নিখিলেশকে আরও বেশি শক্তি যুগিয়েছে মানবপূজারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। নিখিলেশ যে বাড়িতে জন্মেছে সেই বাড়ির কারো কোনো উপদেশ রক্ষা না করলেও চন্দ্রনাথের কথাকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি। কেন উপেক্ষা করতে পারেননি তা তাঁর কথায় স্পষ্ট –

> "...তাঁর পবিত্র মূর্তিখানি নিয়ে আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠাতা করেছেন -তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি।"[২২]

মানুষের জীবনের একটা অন্যতম দিক হল সংযম ও সহ্যশক্তি। অহেতুক উত্তেজিত না হয়ে ধীরে-সুস্থে একটা সুচিন্তিত সমাধান করার শক্তি নিখিলেশের মধ্যে ছিল যেটা বিমলা, সন্দীপের মধ্যে ছিল না। ন্যায়পরতার দায়িত্বকে এড়িয়ে তিনি কখনো অন্যায়ের দ্বারা পরিচালিত হতেন না। তাই কোন কিছু অন্যায় চোখের সামনে দেখলে তিনি বুঝিয়ে বলতেন কিন্তু রেগেমেগে গিয়ে হঠাৎ কিছু সিদ্ধান্ত বা কটু কথা বলতেন না। প্রেমের দ্বারাই তিনি বুদ্ধের ন্যায় সত্যকে জয় করতে চেয়েছেন। তাঁর বাকসংযম, ন্যায়পরায়ন, সহনশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে। তিনি বিমলার ধৈর্যের পরিপেক্ষিতে নিজ প্রসঙ্গে বলেছেন -

> "ধৈর্যের পরে বিমলের ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ এমন-কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে। ...আমি বরঞ্চ কাজের ত্রুটি সহ্য করি তবু চাকর-বাকরকে মারধোর করতে পারিনা, কারও উপর রেগেমেগে হঠাৎ কিছু একটা বলতে বা করতে আমার সমস্ত দেহমনের ভিতর একটা সংকোচ বোধ হয়।"[২৩]

যথার্থ জ্ঞান, দৃঢ় প্রত্যয়, ন্যায়সঙ্গত আচরণের মতো অতিরিক্ত মোহও মানুষের দুঃখের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য জীবিকা হতে হবে মহৎ; জীবনের জন্য জীবিকা। এই জীবনবোধ নিখিলেশের মধ্যে নিহিত ছিল। ভোগ-বিলাসের জন্য ধন সঞ্চয় করে সুখে জীবন যাপন করার কোনো মোহ তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর মতে –

> "সুখদুঃখ কেবলই জমিয়ে তুলতে থাকলে বোঝা ভারী হয়ে ওঠে। কেননা বসে থাকাটা মিথ্যে, সঞ্চয় করাটা মিথ্যে। আমি যে এই ঘরের কর্তা এটা বানানো জিনিস, সত্য এই যে, আমি জীবন পথের পথিক।"[২৪]

সত্যানুসন্ধিৎসু ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে দেখেছেন। ইতিহাসের গতিপথে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের নিকট মহামানব রূপেই প্রতিভাত হয়েছেন এবং এই মানবীয় মহিমার প্রতিই তিনি অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশের আলোকে দেদীপ্যমান এই মানবমহিমার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের যথার্থ পরিচয় খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী মহাবিনাশের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে বুদ্ধের বাণীতে। অনন্তপুণ্য বুদ্ধের দক্ষিণপানির কল্যাণস্পর্শে ধরণীর রক্তলেখা মুছে যাবে, পৃথিবী আবার শুচিস্নাত হবে। বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধসংস্কৃতির মাধ্যমে ভারতবর্ষ যেখানে আপন সার্থকতা উপলব্ধি করেছে প্রধানত সেখানেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি নিবদ্ধ। আর বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধধর্ম-দর্শন এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ অন্যকে যা দিতে পেরেছে, রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যেই দেখেছেন ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্য। বুদ্ধদেবের বাণীতে ভারতবর্ষ একদিন যে সত্য লাভ করেছিল তা শুধু ধর্মতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন সেই সত্যের প্রেরণায় ভারতের মনুষ্যত্ব শিল্পকলায়, বিজ্ঞানে, ঐশ্বর্যে পরিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল। জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে তারই প্রভাব মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথবাবু, বিশেষ করে নিখিলেশের আত্মকথায় ফুটে উঠেছে। অহিংসা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ত্যাগ, মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও মোহমুক্তির পাশাপাশি যথার্থ জ্ঞান, দৃঢ়প্রত্যয়, ন্যায়সঙ্গত আচরণ প্রভৃতি বৌদ্ধদর্শনের নানা দিক পরোক্ষভাবে নিখিলেশের মধ্যে লক্ষ করা যায়। নিখিলেশের এই মানবিক ধর্মবোধের নেপথ্যে বুদ্ধমহিমা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তা নিশ্চিত করে যেমন বলা যায় না, তেমনি জোর করে পুরোপুরি অস্বীকারও করা যায় না, তবে বৌদ্ধধর্মের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ কতটা মানবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা তাঁরই কথা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি –

> "ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।"[২৫]

রবীন্দ্রভাবনায় বুদ্ধমহিমার এই মানবতার ইতিবাচক রূপ উপন্যাসে নিখিলেশ চরিত্রটির মধ্যে যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, তাতে মূলত বুদ্ধ ও রবীন্দ্র ভাবনার মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে বুদ্ধদেবের নৈতিক আদর্শের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছেন এবং এই আদর্শকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. দত্ত, ড.ভবতোষ (সম্পাদিত), 'মোহিতলাল মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৬, মার্চ ১৯৭০, পঞ্চম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১১, নভেম্বর ২০০৪, পৃ. ১১০

২. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র, 'বঙ্কিম রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, দোলপূর্নিমা ১৩৬১, দশম মুদ্রণ, ভদ্র ১৩৯৫, পৃ. ৩৮৩
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গীতাঞ্জলি', শান্তিনিকেতন গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ,১৯১০ পৃ. ১১৯-১২০
৪. বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল, 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, কার্তিক ১৩৯৫, পৃ. ৮৩
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিচিত্র প্রবন্ধ', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩১৪, তৃতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৫৭, পৃ. ৯৩
৬. শ্রী ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র', কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা-৭০০০৪৬, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, চতুর্থ প্রকাশ, মার্চ ২০১২, পৃ. ৮৭৬
৭. তদেব, পৃ. ৯১৩
৮. রায়, জীবেন্দু, 'রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ কালান্তর ও অন্যান্য রচনা', গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, তৃতীয় গ্রন্থ বিকাশ সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ১০৩
৯. ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র', কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা-৭০০০৪৬, চতুর্থ প্রকাশ, মার্চ ২০১২, পৃ. ৯৪৩
১০. রায়, জীবেন্দু, 'রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ কালান্তর ও অন্যান্য রচনা', গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, তৃতীয় গ্রন্থ বিকাশ সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ১৭১
১১. ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র', কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা-৭০০০৪৬, চতুর্থ প্রকাশ, মার্চ ২০১২, পৃ. ৯৫৭
১২. তদেব, পৃ. ৯৫৭
১৩. তদেব, পৃ. ৯৩৪
১৪. তদেব, পৃ. ৯৬০
১৫. তদেব, পৃ. ৮৮০
১৬. তদেব, পৃ. ৯১৩
১৭. তদেব, পৃ. ৯৩৫
১৮. তদেব, পৃ. ৯৭২
১৯. তদেব, পৃ. ৮৮০
২০. তদেব, পৃ. ৯৪১
২১. তাদেব, পৃ. ৮৯৩
২২. তদেব, পৃ. ৮৮১
২৩. তদেব, পৃ. ৮৮০
২৪. তদেব, পৃ. ৯৭৬
২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিচিত্র প্রবন্ধ', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৫৭, পৃ. ৯৩-৯৪